১৭ই এপ্রিল

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস ২০২৪

বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ❑ সম্পাদনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), সহযোগিতায় : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৪ বৈশাখ ১৪৩১
১৭ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

আজ ১৭ এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল এক স্মরণীয় দিন। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান-কে, যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালনার মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারী সকল স্তরের জনগণ ও বিদেশি বন্ধুদেরকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামের যে পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে একটি সাংবিধানিক সরকার আত্মপ্রকাশ করে। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহযোগিতার পথ প্রসারিত হয়। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাঁথার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অবস্থান নিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্ববাসীর কাছে রোল মডেল। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতুসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ মেগাপ্রকল্পগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। আমি মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করবে- এই প্রত্যাশা রইলো।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল তথা ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এক গৌরবোজ্জ্বল দিন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত পরিণতি দেয়ার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার নিভৃত পল্লী বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিপরিষদের ঐতিহাসিক শপথের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। ছায়াঘেরা-পাখি ডাকা বৈদ্যনাথতলা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামধারণ করে নিমিষেই পরিচিতি লাভ করে মুজিবনগর নামে।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতাসহ ৩০ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালি জাতি চিরকাল ধারণ করবে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ব্যস্তবে রূপদান করেছে।

স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পার হলেও মুজিবনগর দিবসের মর্যাদা আজও স্বগৌরবে অক্ষুণ্ন আছে। এই দিনটির চেতনা বুকে ধারণ করে আমরা বঙ্গবন্ধুর রক্তের ও আদর্শের উত্তরাধিকার, সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো- এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস'। এ বিশেষ দিনে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতি, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী নির্দেশনা ছিল মুজিবনগর সরকারের নিরন্তর প্রেরণার উৎস ও প্রধান চালিকাশক্তি । কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত চার জাতীয় নেতাকে এবং পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের আত্মত্যাগ বাঙালির ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

'মুজিবনগর দিবস' বাঙালির মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গৌরব-গাঁথা এক অনন্য দিন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, মহান মুক্তিযুদ্ধকালে এই দিনে ততকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন মুজিবনগরে সেই সূর্য উদিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের এ দিনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত এ ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ৭০ এর নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং পাঠ করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, যা বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে বাকবদলের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' গঠন করা হয় এবং মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে 'মুজিবনগর' নামকরণ করে রাজধানী ঘোষণা করা হয়। এ ঐতিহাসিক দিনে জারি করা হয় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' (Proclamation of Independence)। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন করা হয় এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিটি নিয়ামককে এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে রূপায়িত করা হয়।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। জাতির পিতার অনুপস্থিতিতে তাঁরই নির্দেশিত পথে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা, দেশের জনগণকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করা মুজিবনগর সরকারের অনবদ্য অবদান। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতায় বহির্বিশ্বে গড়ে ওঠে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি ও বিশ্বজনমত; বিশ্ববাসী জানতে পায় বাঙালির আজন্ম লালিত স্বপ্ন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা। এ সরকারের দক্ষ নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধকে সুনিপুণভাবে পরিচালিত করে মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা;বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস আমাদের সামনে একটি আলোকবর্তিকা। স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির একটি স্বর্ণ সোপান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ঐতিহাসিক দিবসের প্রেরণা জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৪১-এর উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উজ্জীবিত করবে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচনে জোরালো ভূমিকা রাখবে। এই মহান কর্মযজ্ঞে আমরা দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করি, এ বিশেষ দিনে এটি হোক আমাদের প্রত্যয়।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইসরাত চৌধুরী

মুজিবনগর সরকার গঠনের কূটনৈতিক গুরুত্ব

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালিন মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআরের ওয়্যারলেসে স্বাধীনতার ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে প্রচারের জন্য মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। মার্চ মাসের ২৬ ও ২৭ তারিখে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (পরের নামকরণ- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণাসহ আরও দুটি ঘোষণা প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা-

ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অংশে জনগণের উপর আক্রমণ চালালে ঊর্ধ্বতন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেন। বহির্বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার গঠন অত্যাবশ্যক ছিল। তখন ভারতে অবস্থানরত এমএনএ ও এমপিএদের সাথে বৈঠক করে ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা কার্যকর করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেন এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার গঠন করা হয়।

গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের যেসকল সদস্য ১০ এপ্রিলের মধ্যে কলকাতায় মিলিত হন তাঁরা একটি আইন পরিষদ গঠন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরের মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করে মুজিবনগর সরকার তথা প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোশতাককে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য এবং জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করা হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে এ সরকার শপথ নেয়। এই ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং অনুমোদন দেয়। তারপর থেকে বৈদ্যনাথতলা 'মুজিবনগর' নামে পরিচিত, আর এ দিনটি পালিত হয় 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছর সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। অনেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুধু সামরিক যুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল জনযুদ্ধ। এ জনযুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে ২৩ বছরে বাঙলি জাতিকে প্রস্তুত করেছেন।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলায় (পরবর্তী নাম মুজিবনগর) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপরিষদ সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে নবগঠিত আইন পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়।

ঘোষণাপত্রে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাবলে মুজিবনগর সরকার বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং এ ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে চেইন অব কমান্ড স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মুজিবনগর সরকারের অধীনে ছিল নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনী, যে দু'টি মিলিয়ে হচ্ছে মুক্তিবাহিনী। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদসহ পূর্ণাঙ্গ সচিবালয়ও কাজ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এ ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সে ম্যান্ডেট মোতাবেক '৭০ এর নির্বাচনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে মুজিবনগর সরকার গঠন করে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অধ্যাপক ইউসুফ আলী কর্তৃক বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ঘোষণা প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয়। এমনকি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঘোষণাপত্র দেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর থাকে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণই ছিল স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা এবং যুদ্ধের দিক নির্দেশনা। পাকিস্তান যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে অপপ্রচার না চালাতে পারে সেকারণে ৭ মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি। আমার মতে এ ভাষণ ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক ও দূরদর্শী বক্তব্যের শুরুতে পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের শোষণের ইতিহাস উল্লেখ করেন। '৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় থাকতে না পারা, ভাষা আন্দোলন, ৬দফা আন্দোলন, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি। তিনি বক্তেব্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন, নিজ ভূমিকা ও আবস্থান ব্যাখ্যা করেন; পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিকদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন; সামরিক আইন প্রত্যাহারের ও জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান; অত্যাচার ও সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলার আদেশ দেন; দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সার্বিক হরতালসহ সার্বিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি প্রসঙ্গে অবতারণা করেন।

এ ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা এমনভাবে দেন যে, বিশ্বের কেউ তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে না পারে অপর দিকে গেরিলা যুদ্ধেরও পূর্ণ নির্দেশন প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ট সহচর জাতীয় চার নেতাসহ ঘনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকালিন করণীয় সম্পর্কে তাঁর নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর সরকার তথা প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং পরিচালনা করে।

যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পূর্ব থেকেই ভারতের মহিয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, ট্রেনিং এবং অস্ত্রের যোগান দানের সম্মতি আদায় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ পরিচালনা, বৈদেশিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা, অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহসহ একটি স্বাধীন সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার কাজ করে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।

নিঃসন্দেহে, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। বিষয়টি বোঝার জন্য মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি মুজিবনগরকে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার সাথে তুলনা করেন, যেখানে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। সন্দেহ নেই মোটাদাগে সিনেটর কেনেডির মন্তব্য যথার্থ। বিশ্বের চোখে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সম্প্রসারিত পর্যায়, তা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। বিশ্ববাসীর কাছে এটাও নিশ্চিত করা যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বের প্রতি সমস্ত জনগোষ্ঠীর এবং স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সমর্থন আছে। এগুলো সম্ভব হয়েছে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বিশ্বের চোখে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা মুজিবনগর সরকরের জন্য যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি ছিল ভারত সরকারের জন্য।

আমি মনে করি মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমরা পরাজিত হতাম। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো যখন ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তখন এ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের অবস্থানকে সুসংহত করে। মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে পাকিস্তানিরা সহজেই চিহ্নিত করত। পশ্চিমা দেশসমূহসহ আমাদের স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও উপদল সৃষ্টি করে ভাঙ্গন ধরাতো। এ রকম এক পরিস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের যে কোন একটি ভুল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে নস্যাৎ করতে পারতো যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। যে কারণে নস্যাৎ হয়েছে আইআরএ আন্দোলন, স্পেনের বাস্ক কান্ট্রি আন্দোলন ও তামিল টাইগারদের আন্দোলন।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বীরদর্পে যুদ্ধ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে। নয় মাস ব্যাপী এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা ও অত্যাচার চালায়। এতে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন এবং ২ লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারান। ১৬ ডিসেম্বর পাক-হানাদার বাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযোদ্ধা ও যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের মাধ্যমে ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের সমাপ্তি হলেও বাঙালি বিজয়ের স্বাদ পায়নি। ১০ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের এই দিনে সকল বীর শহিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ মুজিবনগর সরকারের সকল কুশীলবদের প্রতি জানাই সশস্ত্র সালাম। সেই সাথে ঘৃণা জানাই বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী এবং সকল স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি দোসর ও যুদ্ধপরাধীদের প্রতি। ❑

লেখক: মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা।